মূলপাতা

সভ্যতা ও অবক্ষয় - বংশগতি

Asif Adnan

October 16, 2018

13 MIN READ

খবরগুলো নিয়মিত বিরতিতে সামনে আসে। পশ্চিমের নানা যৌন বিকৃতির বিচিত্র সব গল্প। সমকামিতা, উভকামিতা, শিশুকামিতা, পশুকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডার আরো কতো কী। আমরা হেসে এড়িয়ে কিংবা ভুলে যাই। অথবা পশ্চিমাদের অসভ্যতা নিয়ে ধরাবাঁধা কিছু কথা বলি। অন্য কিছু খবরও নিয়মিত বিরতিতে চোখে পড়ে। দেশে ক্রমাগত বাড়তে থাকা ডিভোর্স, গর্ভপাত আর লিভ টুগেদার নিয়ে 'চাঞ্চল্যকর' বিভিন্ন প্রতিবেদন। মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় লেইট নাইট পার্টি, কিংবা সমকামিদের বিভিন্ন 'গেট টুগেদারের' কথা। আর প্রতিনিয়তই, পত্রিকায়, রাস্তায়, বিলবোর্ডে, টিভি স্ক্রিনে, ব্রাউযার খুললেই চোখে পড়ে নতুন কোন বিজ্ঞাপন, সাহসি কোন সিনেমা কিংবা দৃশ্য নিয়ে প্রতিবেদন, ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি, নারী দেহের পণ্যায়ন, নারীর নিজেকে প্রদর্শন, আদিম হাস্যরসে মেতে ওঠা আড্ডবাজদের হাসি, পথচারীর আড়চখের দৃষ্টি, পুঁজিবাদের যৌনকরন, হুকআপ কালচার নিয়ে জমে ওঠা অনলাইন বিতর্ক, ভাইরাল কোন ভিডিও, কিংবা কোন সুশীল বুদ্ধিজীবির কলাম – চোখ খুললেই চোখে পড়ে যৌনতা নিয়ে অবসেসড, যৌনন্মাদ এক সমাজ।

কেন?

যৌনতার ব্যাপারে বর্তমানে আমরা যেসব প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা, এড়িয়ে যাওয়া কিংবা ধরাবাঁধা কিছু কথা বলে দায়িত্ব শেষ করা সহজ। নৈতিক এই বিপর্যয়কে দেখিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার নোংরামি তুলে ধরা কার্যকর। কিন্তু এই অবস্থা যে আরো গভীর ও মৌলিক কোন সমস্যার উপসর্গ এবং এই বাস্তবতা যে আরো কঠিন কোন পরিনতির ইঙ্গিত বহন করে - সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, অথবা আমরা বিষয়টাকে সেভাবে দেখি না। সেই গভীর ও মৌলিক সমস্যা, সেই কঠিন পরিণতি কী – সেই আলোচনায় আমরা যাবো। তবে তার আগে আমাদের জানতে ঠিক কিভাবে, কোন পথে আমরা আজকের এই অবস্থায় এসে পৌছলাম।

'বিপ্লবের' বংশগতি

যৌনতা ও নৈতিকতার ব্যাপারে আজ আমরা যে অবস্থা দেখছি - সমকামি 'বিয়ের' আইনী স্বীকৃতি, সমকামিতাকে প্রশংসনীয় সাব্যস্ত করা, ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট, বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার ব্যাপক প্রচলন, ব্যাপক গর্ভপাত, বিয়ে ও পরিবারের পবিত্রতা - এগুলোর ব্যাপারে সাধারন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিশুকাম, পশুকাম, অজাচারসহ বিভিন্ন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরনের চেষ্টা – এই সবকিছুই ষাট ও সত্তরের দশকের সেক্সুয়াল রেভোলুশান এর ফসল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং সাদা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে অ্যামেরিকার। এ সময়কার প্রজন্মকে বলা হয় 'দা গ্রেইটেস্ট জেনারেইশান'। ১৯০০ থেকে ১৯২০ এর মাঝে জন্ম নেয়া এই 'গ্রেইটেস্ট জেনারেশনই দূরদেশে গিয়ে লড়াই করেছিল বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বদলে দেয়া মহাযুদ্ধে। আর যারা দেশে ছিল তারা সচল রেখেছিল যুদ্ধকালীন অর্থনীতির চাকা। মহাযুদ্ধের বিজয়ী এ প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল বিশের দশকের ভয়ঙ্কর মন্দা, নানা সামাজিক অস্থিরতা আর যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। এ প্রজন্ম ছিল পরিশ্রমী, বাস্তবমুখী এবং তাদের নৈতিকতা ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রগাঢ় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝড় সবকিছু আমূল বদলে দেয়। পঞ্চাশের দশকের বিট জেনারেইশান আর ষাটের দশকের হিপি মুভমেন্ট আগের প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া চিন্তাগুলোকে আক্রমন করতে শুরু করে। রক অ্যান্ড রৌল, হলিউড, প্লেবয়, পেন্টহাউস, অ্যাকাডেমিয়া আর ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। 'মহান' প্রজন্মের সন্তানরা বেড়ে ওঠে জীবন ও নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় বিপরীতমুখী এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।। চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও

দর্শনে দুই প্রজন্মের মাঝে তৈরি হয় এক গভীর বিভাজন। আর এর এ বিভক্তি তুঙ্গে পৌছায় সেক্সুয়াল রেভোলুশানের মাধ্যমে, যখন যৌনতার ব্যাপারে গ্রেইটেস্ট জেনারেশানের ধর্মীয় নৈতিকতা ছুড়ে ফেলে অ্যামেরিকা আলিঙ্গন করে নেয় ফ্রি সেক্সের প্যাইগান দর্শনকে। এ প্রজন্মের চিন্তায় গেথে যায় সব ধরনের যৌনাচার আর বিকৃতির অবাধ প্রচলন ও বৈধতার এক দর্শন। পরবর্তী ৫০ বছরে এই সেক্সুয়াল রেভোলুশনেরই নানা ফসল বিভিন্নভাবে আমাদের আজকের এই বাস্তবতাকে তৈরি করেছে।

ষাটের দশকের শেষদিকে শুরু হওয়া সেক্সুয়াল রেভোলুশানের ভিত কিন্তু স্থাপিত হয় আরো আগে। সেক্সুয়াল রেভোলুশান নামের সভ্যতার অবৈধ এ সন্তানের বংশগতি খুব সংক্ষেপে ও সিমপ্লিফাই করে এভাবে উপস্থাপন করা যায় –

মানুষের মনোদৈহিক প্রায় সব ধরনের সমস্যার কারন হিসেবে অবদমিত কামনাবাসনা তথা যৌনতাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সেক্সুয়াল রেভ্যুলুশানের প্রাথমিক কাঠামো দাড় করায় সাইকোঅ্যানালাইসিসের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মানুষের ব্যাক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অনুপ্রেরণা – প্রায় সবকিছুর পেছনে ফ্রয়েড যৌনতা খুজে পায়। ফ্রয়েডের মতে মানবজীবনের সব আনন্দ ও কষ্টের সম্পর্কলিবিডোর (যৌনতাড়না) সাথে। এমনকি শিশুকেও ফ্রয়েড আবিস্কার করে যৌন প্রাণী হিসেবে। ফ্রয়েডের চিন্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায় উইলহেম রাইশ এবং হার্বার্ট মারকিউসের মতো লোকেরা। তবে ফ্রয়েডের তৈরি করা কাঠামো ওপর দাঁড়িয়ে যে মানুষটি সত্যিকার অর্থে সেক্সুয়াল রেভোলুশান এবং আমাদের আজকের এই যৌনন্মাদ সমাজের জন্ম দেয় তার নাম অ্যালফ্রেড কিনসি। রকাফেলার ফাউন্ডেইশানের সমর্থন নিয়ে কিনসি ফ্রয়েডের চিন্তার সাথে যুক্ত করে নতুন এক দিক।

কিনসি দাবি করে মানুষের যৌনতা নির্দিষ্ট কোন কাঠামোতে আবদ্ধ না। মানব যৌনতা ক্রমপরিবর্তনশীল, বহমান। কিনসির মতে, যৌনতার ক্ষেত্রে ন্যায়অন্যায়ের কোন ধারণা নেই। যৌনতা সাদাকালো বাইনারি কোন সিস্টেম না, বরং মানুষের যৌনতা রংধনুর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ, অনেক মাত্রা। রংধনুর একপ্রান্তে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা আর অন্য প্রান্তে সমকামিতা। এ দুইয়ের মাঝে আছে শিশুকামিতা, পশুকামিতা, উভকামিতা থেকে শুরু করে সবধরনের ফেটিশ, সবধরনের বিকৃতি। সমাজের মানুষেরা একেকজন এই স্পেকট্রাম বা বর্ণালীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে। আবার একজন মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বর্নালীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে। তবে কিনসির মতে অধিকাংশ মানুষ দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থানের দিকে থাকে, অর্থাৎ উভকামিতায়। কিন্তু সমাজ, সংস্কার ও ধর্মের মাধ্যমে আরোপিত নৈতিকতার কারনে মানুষ এই স্বাভাবিক অবাধ যৌনতার প্রবণতাকে চেপে রাখে। একে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে অথবা নিজের আসল যৌনাচারকে গোপন রেখে সমাজের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাভাবিকতার মুখোশ পড়ে থাকে। পাশাপাশি কিনসি তার কুখ্যাত দুটি বইয়ের (Sexual Behavior In The Human Male/Female) মাধ্যমে 'প্রমান' করে দেখায় যে যেগুলোকে আমরা বিকৃত যৌনতা বলি সেগুলো আসলে অনেক বেশি প্রচলিত। সমকামিতা, উভকামিতা, বহুগামিতাসহ – অনেক কিছুই সমাজের অনেকেই করে। কিন্তু তারা সেটা গোপন রাখে। ঐ যে, পাছে লোকে কিছু বলে!

এই দাবির পক্ষে কিনসি বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। যদিও কিনসির উপস্থাপিত পরিসংখ্যান দিয়ে তার দাবি প্রমানিত হয়, কিন্তু আসল ফাকিটা ছিল তার পরিসংখ্যানেই। কিনসি যাদের সাক্ষাতকার নিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশাল একটি অংশ ছিল পতিতা, সমকামি পুরুষ পতিতা (পতিত?), সমকামি, যৌন অপরাধের কারনে কারাভোগকারী, এবং পেডোফাইল। অর্থাৎ কিনসি প্রশ্ন করার জন্য এমনভাবে মানুষ বেছে নিয়েছিল যাতে বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত মানুষদের অনুপাত বেশি হয়। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন। আপনি যদি চুরির ওপর বাংলাদেশের ১০০ জন মানুষের ওপর জরিপ চালান, আর ইচ্ছে করেই সেখানে ৫০ জন চোরকে রাখেন তাহলে অবশ্যই আপনার জরিপের ফলাফলে দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪০-৫০% মানুষের মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে। কিনসি ঠিক এ কাজটাই করেছিল।

তবে এই আমরা এখন বলতে পারলেও কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ কাজটা এতোটা সহজ ছিল না। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে আর পঞ্চাশের দশকে কিনসির 'রিসার্চ'ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। রকাফেলার ফাউন্ডেশানের প্রত্যক্ষ অর্থায়ন ও সমর্থনে অ্যামেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে কিনসি নানা সেমিনারে নিজের আবিস্কৃত 'বৈজ্ঞানিক সত্য'গুলো প্রচার করে দাঁড়ায়। তার বইগুলো পরিণত হয় বেস্টসেলারে এবং কিনসির এই জালিয়াতি ভরা গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে

যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি। কিনসির উপসংহারের ওপর ভিত্তি করে স্কুলের যৌনশিক্ষা বই এবং আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। সেক্সুয়াল রেভলুশানের দুজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়ার, প্লেবয় ম্যাগাযিনের হিউ হেফনার এবং সমকামি অধিকার আন্দোলনের হ্যার হেই- গভীরভাবে কিনসির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। দুজনের ভাষ্যমতেই কিনসি Sexual Behavior In The Human Male – বইটি ছিল তাদের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট, এবং এই বইটি পড়ার পরেই তারা নিজেদের জীবনের গতিপথ বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিনসির দেয়া ন্যায়অন্যায় থেকে মুক্ত যৌনতার বর্ণালীতে নতুন একটি অক্ষ যোগ করে জন্স হপকিন্সের ড. জন মানি। যৌনতা (sexual preference), লিঙ্গ (gender) ও লৈঙ্গিক পরিচিতি (gender identity) – এর মাঝে মানি পার্থক্য খুজে বের করে। মানুষের যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় জন্মগতভাবে নির্ধারিত না। মানুষের ধরাবাঁধা কোন যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় নেই। যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বিকৃতি, অবিকৃতি বলে কিছু নেই –আধুনিক যৌনতার ধারনায় এই চিন্তাগুলো যুক্ত করার মাধ্যমে জন মানি বর্তমানের ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মূল দাবিগুলোর ব্যাখ্যা তৈরি করে। অন্যদিকে ফ্রয়েড, মার্ক্স আর রাইশের চিন্তার সমন্বয় করার মাধ্যমে কালচারাল মার্ক্সিসম ও আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ছাঁচে সমকামিতা সহ অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের স্বাভাবিকীকরনের আন্দোলনের জন্য একটি আদর্শিক কাঠামো তৈরি করে ফ্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের হার্বাট মারকিউস।

কিনসি ও বিশেষ করে মানির কাছ থেকে আসা ধারণাগুলো লুফে নেয় ষাট ও সত্তরের দশকে তুঙ্গে থাকা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট। এই যে "বৈজ্ঞানিক প্রমান' পাওয়া গেছে, নারী ও পুরুষ আসলে একই। তাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পুরুষ যা পারে নারীও তা পারে। পুরুষ ও নারীর চিন্তা, সামর্থ্য, সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকার যে পার্থক্য সমাজে আছে তা জোর করে চাপিয়ে দেয়া। পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে এসব ধারণা গড়ে উঠেছে।। যুগে যুগে পুরুষরা ষড়যন্ত্র করে এসবের মাধ্যমে নারীদের ঘরে বেধে রেখেছে। প্রথা, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদিকে তারা ব্যবহার করেছে নারীদের আবদ্ধ রাখার জন্যে।।

নারীবাদে এসে সাইকোলজি, সেক্সোলজি, বিকৃতি, মানবিক পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভূত এক জগাখিচুড়ি তৈরি হয়। যৌনতা, পরিবার, মানবপ্রকৃতিসহ যেকোন কিছুকেই নির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ফসল হিসেবে দেখানোর পোস্টমর্ডানিস্ট যুক্তিও তারা গ্রহন করে। যার ফলে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারের প্রতিষ্ঠিতই ধারনাগুলোকে আউটডেইটেড বলে নাকচ করে দেয়া সম্ভব হয়। এর সাথে আরো যুক্ত হয় আপেক্ষিত নৈতিকতা (moral relativism) ও এবং কোন চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করার প্রবণতা। ভালো ও খারাপের কোন ধরাবাধা সংজ্ঞা নেই, মানুষই ভালোমন্দের তৈরি করে। সময়ের সাথে ভালো ও খারাপ বদলাতে থাকে। সকল সত্যই আপেক্ষিক, প্রতিটি সত্যই কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শক্তির কাঠামোর সাপেক্ষে সত্য – আপেক্ষিক নৈতিকতা ও আপেক্ষিত সত্যের অপ্রকৃতস্থ ধারনার ওপর গড়ে ওঠা এসব পোস্টমর্ডানিস্ট তর্কের মাধ্যমে সম্ভব হয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, বিকৃতি এমনকি বায়োলজিকেও একপাশের সরিয়ে রাখা। ধাপে ধাপে ডিকন্সট্রাক্ট করা হয় গ্রেইটেস্ট জেনারেইশনের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও দর্শনকে।

নারীবাদ আক্রমন করে পরিবারকে। কারন পরিবার হল পুরুষতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার। পরিবার একটি 'পুরুষতান্ত্রিক' কাঠামো যার উদ্দেশ্য নারীকে ঘরে আটকে রেখে পুরুষের আধিপত্য নিশ্চিত করা। নারীবাদ নারীকে শেখাতে শুরু করে, 'একজন নারীর পুরুষের কোন দরকার নেই। প্রয়োজন নেই পরিবারের মধ্যে নিজের পরিচয় বা পূর্ণতা খোজার। সন্তান তোমাকে শুধু আরো পিছিয়ে দেবে। বরং তোমার উচিত নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের ব্যাক্তিত্ব, নিজের ক্যারিয়ারের মাঝে সাফল্য খোঁজা। আর শরীরের চাহিদা? সেক্স? তার জন্য বিয়ের কী দরকার? সেক্স শুধু শরীরের জন্য, আনন্দের জন্য। যা ইচ্ছে করো, কিন্তু এর সাথে আর কোন কিছু জড়ানোর প্রয়োজন নেই। বহুগামীতাকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখার এই প্রবনতাও নারীবাদ গ্রহন করে সেক্সুয়াল রেভোলুশানের কাছ থেকে। নারীবাদের ভাষায় বার্থ কন্ট্রোল পিলসহ অন্যান্য জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ও যেকোন সময়ে গর্ভপাতের সুযোগ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারীকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেয়। আর এভাবেই সব শেকল থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতা পরিণত হয় নিছক আনন্দের এক অতৃপ্ত অন্বেষণে।

ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের শুরুর দিকে শুরু হওয়া ফ্রি লাভ/ফ্রি সেক্স মুভমেন্ট ও সমকামি অধিকার আন্দোলনও পুরোপুরিভাবে এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করে। তাদের জন্য এটা একটা সহজ সিদ্ধান্ত ছিল। প্রচলিত পরিবার কাঠামো, নৈতিকতা, যৌনতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি – এসবকিছুই সমকামি ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের আচরন ও দর্শনের সাথে মেলে না। কিন্তু সমকামিতা বা বিকৃতকামিতার জায়গা থেকে পরিবার বা নৈতিকতার সমালোচনা করা স্ট্র্যাটিজিকালি ভুল। এতে করে সমকামিরা যে অচ্ছুৎ, সমাজবিরোধী – এই ধারনাই আরো শক্ত হবে। কিন্তু স্ট্র্যাটিজিক হিসেবনিকেশের কারনে সমকামিরা যা প্রকাশ্যে বলতে পারছিল না, খুব সহজ সেই কাজটা করতে পারছিল নারীবাদীরা। তাই সমকামি আন্দোলনের সাথে নারীবাদীদের জোট বাধা ছিল যৌক্তিক এবং স্বাভাবিক। এই দুই আন্দোলন আজও হাতেহাত রেখেই চলছে।

ষাট ও সত্তরের দশকে যা ছিল (নৈতিকতা, পরিবার, যৌনতা ইতাদির ব্যাপারে) খুব র‍্যাডিকাল 'বিপ্লবী চিন্তা, পরের দশকগুলোতে সেগুলোই ধীরে ধীরে স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয়। কিনসি, মানি ও মারকিউসদের দর্শন আর ফেমিনিস্ট থিওরিগুলো অবিসংবাদিত সত্য হিসেবে শেখানো হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ওপর এই চিন্তাধারা প্রায় একচ্ছত্র আধিপ্ত্য বিস্তার করে। আর বিভিন্নভাবে সাধারন মানুষের চিন্তায় এ বিশ্বাসগুলো গেথে দিতে থাকে ম্যাস মিডিয়া। এই কলুষিত দর্শন, চিন্তার বিকৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে।

এই মিশ্রণ থেকেই একসময় বের হয়ে আসে হেজেমনিক ও টক্সিক ম্যাস্কিউলিনিটি – এর ধারণা। টক্সিক ম্যাসকিউলিনিটির এ তত্ত্ব দাবি করে, যা কিছুকে স্বাভাবিকভাবে পুরুষালি বলে গণ্য করা হয়, যেসব আচারআচরণ ও বৈশিষ্ট্যকে সমাজ পুরুষোচিত বলে উপস্থাপন করে, তার সবই বিষাক্ত। কারণ পুরুষত্বের এই ধারণা তৈরিই হয়েছে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। এই 'পুরুষত্ব' মানবতার জন্য ক্ষতিকর। সত্ত্বাগতভাবেই এই 'পুরুষ' অত্যাচারী, সম্ভাব্য ধর্ষক, সমাজ ও সভ্যতাকে কলুষিতকারী। এভাবে নারীবাদ পুরুষত্বের ধারণাকেই আক্রমন করে বসে আর এর মাধ্যমে অনিচ্ছায় ও অজান্তে আক্রমন করে নারীত্বকেও। এ পর্যায়ে এসে নারীবাদ দাবি করে, যা কিছু নারীসুলভ বলে স্বীকৃত তা আসলে পুরুষতন্ত্রের ফসল। নারী তখনই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে, যখন সে পুরুষতন্ত্রের তৈরি ছাঁচ থেকে বের হতে পারবে। আর পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত তখনই পূর্ণ হবে যখন সে সমাজস্বীকৃত পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলবে আর নিজের পুরুষ পরিচয় আর ঐতিহাসিক 'অপরাধের' কারনে লজ্জিত হবে। তাই - যদি পুরুষ কতৃত্বশীল হয় তাহলে সে অত্যাচারী। যদি সে দৃঢ়চেতা হয়, সমাজস্বীকৃত পুরষোচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে সে নারীর ওপর অত্যাচার ও শোষণের এই ফ্রেইমওয়ার্কের একটি অংশ। একইভাবে, যদি নারী সাবমিসিভ হয় তাহলে সে পুরুষতন্ত্রের গোলাম, ব্রেইনওয়াশড। যদি নারী মা ও স্ত্রী হিসেবে নিজের পরিচত বেছে নেয় তাহলে সে বিষাক্ত পুরুষতন্ত্রের ফসল। যদি পুরুষ বিশ্বস্ততা আশা করে তাহলে সেটা ভন্ডামি, যদি নারী বিশ্বস্ত থাকতে চায় তাহলে সে মানসিক দাসত্বের স্বীকার।

নৈতিকতা, যৌনতা ইত্যাদির ব্যাপারে যতো ধারণা আছে, ভালোমন্দ, বৈধ-অবৈধ, বিকৃতি, স্বাভাবিকতা – সব কিছুই কলুষিত পুরুষতন্ত্র এবং ঐতিহাসিক শোষণ ও নির্যাতনের ফসল। সমকামিতা তাই শুধু যৌন সুখের সন্ধান না বরং নিজের স্বাধীনতার প্রয়োগ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একইভাবে বহুগামী নারী হল আধুনিক এক বিপ্লবী। আর দৃষ্টিকোণ সবচেয়ে বড় বিপ্লব হল অ্যান্ড্রোজিনি - ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট – কারন এ আন্দোলন সব প্রথা, প্রচলন আর কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ করছে। পুরুষত্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে পথের শুরু তার পরিসমাপ্তি অ্যান্ড্রোজিনি। টক্সিক ম্যাসকিউলিনিটি তত্ত্বের ফসল হল ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্ট।

এখানে একটি বিষয় বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবিতে বিকৃতকামীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে – ব্যাপারটা এমন না। সব সমাজেই এরা খুব ছোট একটা মাইনরিটি। কিন্তু পার্থক্য হল যৌনতার ব্যাপারে তাদের ধ্যানধারনাগুলো বিপুল সংখ্যক মানুষ মেনে নিয়েছে। মোটা দাগে এই সভ্যতা যৌনতার ব্যাপারে এই দর্শনকে গ্রহন করেছে। যৌনতাকে এখন এভাবেই দেখা হচ্ছে, সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। সমকামি অধিকার, ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকারের নামের এসব বিকৃতির স্বাভাবিকীকরনের কাজ করা হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের মতো সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। আর এভাবেই এই বিকৃতি ও অবক্ষয় সমগ্র সভ্যতার ওপর নিয়ন্ত্রন অর্জন করেছেন। এভাবেই আমরা এমন এক বিচিত্র সময়ে এসে পৌছেছি যখন ৫২ বছর বয়েসি ছয় সন্তানের বাবা নিজেকে ৬ বছরের বাচ্চা

মেয়ে দাবি করে। যখন ৩০ বছরের এক মহিলা প্রথমে নিজেকে পুরুষ দাবি করে আর তারপর পুরুষ কুকুর। যখন ২৮টি দেশে সমকামি 'বিয়ে'কে বৈধতা দেয়া হয়। যখন শিশুকামিতা ও পশুকামিতাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যখন সেইডম্যাসোকিযম, বন্ডেজ, জেন্ডার গেইমসসহ নানা বিকৃতির প্রকাশ্যে উৎসব হয়। যখন আমেরিকাতে বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ আর বাংলাদেশে বছরে সাড়ে ৭ লক্ষের ওপর গর্ভপাত হয়[1]। যখন বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভুত যৌনতা সামাজিক নিয়মে পরিনত হয়। যখন সিনেমা, সাহিত্য, টেলিভিশন, ইউটিউব সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে নকশা, অধুনা, আর পরামর্শের কলাম সন্তান আর সন্তানদের অভিভাবককে শিখিয়ে দেয় উঠতি বয়সে 'প্রেম করা' আর 'শারীরিক ঘনিষ্ঠতা' – স্বাভাবিক একটি ব্যপার। আর যখন এমন কিছু ঘটে যা পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি - পর্নোগ্রাফি ঢুকে পড়ে প্রতিটি ঘরে, চলে আসে প্রতিটি মানুষের হাতের নাগালে, পরিণত হয় শত বিলিয়ন ডলারের এক বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রিতে। আর সেক্সুয়াল রেভোলুশানের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে অ্যামেরিকার কিন্ডাগার্টেন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের 'অধুনা' এর পাতাতে।

এ তো গেল আমাদের বর্তমান আর এই বর্তমানের শেকড়ের কথা। কিন্তু এই বাস্তবতা কীসের উপসর্গ? আর এ বর্তমান কোন ভবিষ্যতের আভাস দেয়? এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বর্তমানকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে।

(ইন শা আল্লাহ চলবে)

* * *

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_statistics_in_the_United_States, https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.ijgo.2014.03.015